ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, আশ্বিন ১৪০৭

ঢাকা মহানগরীর পেশাঃ গতি ও বৈপরীত্য

আনু মুহাম্মদ *

Occupational Matrix: Dynamics and Direction of a Peripheral Economy: A Case of Dhaka City.

Anu Muhammad

Abstract : This article is an outcome of a study conducted in Dhaka city over people from across different occupations and income groups. It attempted an investigation to understand the impact of dynamics and direction of the Bangladesh economy on its labour force. The study findings include emergence of new occupations those are mostly service oriented and highly vulnerable in nature. Low income and insecured jobs have become inevitable container of huge uprooted rural people. High income occupations were also seen which are mostly linked with foreign agencies or big business or trading groups. Decline of productive sectors and rise of 'supper market' and service oriented economy linked with mobility of international capital has been shaping and reshaping the faces of the people of Dhaka city in both poles, i.e. rich and poor.

একটি সমাজের পেশা সেই সমাজ ও অর্থনীতির ধরন, কাল এবং তার যাত্রাপথ নির্দেশ করে, নির্দেশ করে সাংস্কৃতিক ধরনও। পেশা বিশ্লেষণ করলে বোঝা সম্ভব ঐ সমাজের গতি প্রকৃতি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে গত আড়াই দশকে ঢাকা মহানগরীতে যে অসংখ্য পেশা তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত পুরো দেশের অর্থনীতির ভাঙন ও গঠন। এই পেশাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু পুরনো কিন্তু বহু সংখ্যক নতুন। যেগুলো পুরনো সেগুলো আর পুরনো ধাঁচে সবগুলো নেই। নতুনগুলোর অনেকগুলোই আগে ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও ছিল না। বর্তমান প্রবন্ধ ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ- এই দুমাস ধরে ঢাকা শহরের দুই শতাধিক পেশার সহস্রাধিক মানুষের মধ্যে পরিচালিত গবেষণা কাজের উপর ভিত্তি করে লিখিত। যাদের উপর অনুসন্ধান চালানো হয় তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

শিশু-বৃদ্ধ সকলেই ছিলেন। এই অনুসন্ধানে ঢাকা শহরের পেশাগুলো দেখতে গিয়ে সম্পর্কিত বহু বিষয় আমরা গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। আমরা সেসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি, কথা বলেছি, তথ্য বিশ্লেষণ করেছি। এই গবেষণায় যে সব প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুসন্ধান করেছি সেগুলো হল নিম্নরূপঃ

ক) গত কয়েক দশকে কি কি নতুন পেশা তৈরি হয়েছে? পুরনো পেশাগুলোর হাল কি? পেশার গঠন-ভাঙনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ধরন কি ভূমিকা পালন করছে?

খ) যে পেশাগুলো নতুন তৈরি হয়েছে সেগুলোর ধরন কি? এগুলোর কয়টি উৎপাদনের বা দেশের ভেতরে মূল্য সংযোজনের সঙ্গে সম্পর্কিত? কয়টি সম্পর্কিত ব্যবসার সঙ্গে এবং কয়টি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বা যোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত?

গ) নতুনভাবে তৈরি পেশাগুলোর আয়, নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব কেমন?

ঘ) গত আড়াই দশকে উচ্চতম আয় ও ন্যূনতম আয় অনুপাতের ধরন।

ঙ) বিভিন্ন পেশায় আয় ও কাজের সীমা; মাসিক ও ঘন্টা প্রতি আয়।

এসব বিষয়ে আমরা প্রধানতঃ আমাদের নিজস্ব গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করেই বর্তমান লেখাটি তৈরি করেছি। তবে এই বিষয়ে না পেলেও সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন গবেষণা তথ্যও আমরা এই সঙ্গে পর্যালোচনা করেছি।

নতুন পেশা, নতুন বিনিয়োগ

স্বাধীনতার পর গত দুই দশকেরও বেশি সময়ে যে পেশাগুলো এই সমাজে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে যাদেরকে বিশেষভাবে সনাক্ত করা হয়েছে এবং পুরনো পেশাগুলোর পাশাপাশি যাদেরকে আমরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছি সেগুলোর মধ্যে আছে: গার্মেন্টস শ্রমিক, নার্সারি কর্মচারী, ফুলের দোকান শ্রমিক, বেকারি কর্মচারী,

হস্তসামগ্রীর দোকানের কর্মকর্তা ও 'সেলস গার্ল' কম্পিউটার অপারেটর, বেসরকারী হাসপাতালের নার্স, কিন্ডারগার্টেন-কোচিং সেন্টারের শিক্ষক, ম্যাক্সি চালক, মানি চেঞ্জার, ফোন-ফ্যাক্স-ই-মেইল দোকানের মালিক-কর্মচারী, ডিশ ব্যবসায়ী, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, গবেষক-কনসালট্যান্ট, গবেষণা-নির্মাণ সংস্থার অংশীদার মালিক, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দালাল (লবিষ্ট), ব্যয়বহুল বাস বা রেস্তোরাঁর শিক্ষিত কর্মী, বিজ্ঞাপন মডেল, শেয়ার ব্যবসায়ী, বিউটি পার্লারের কর্মী, ফ্যাশন ডিজাইনার, বেসরকারী স্থপতি সংস্থার কর্মী প্রভৃতি।

গত ২৮ বছরে পুরনো পেশাগুলোর মধ্যে কি পরিবর্তন হলো আর নতুন কি পেশা তৈরি হলো তা প্রধানতঃ নির্ভর করে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ধরনের প্রধান প্রবণতার উপর।[১] গত দুই দশকে যে সব প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্র দ্রুত প্রসার লাভ করেছে সেগুলো হলঃ নির্মাণ ফার্ম, আইন ফার্ম, ঠিকাদারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিউটি পার্লার, বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার বিপনন ও প্রশিক্ষণ, রেন্ট-এ-কার, সুপার মার্কেট, হাউজিং, কোচিং সেন্টার, বেসরকারী হাসপাতাল-ক্লিনিক, স্পোকেন ইংলিশ, কিন্ডারগার্টেন-একাডেমী: ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বায়িং হাউজ, সংগঠিত যৌন ব্যবসা, প্রকাশনা, হস্তশিল্প বিপণন, এনজিও, ভিসা-ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, সিকিউরিটি এজেন্সী, গার্মেন্টস, গোপন (বেআইনী) শিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যয়বহুল রেস্তোরাঁ, ব্যয়বহুল বাস, বেসরকারী বিমান, হুন্ডি ব্যবসা, আইনী বে আইনী মাদক দ্রব্য ও অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদি।

বিনিয়োগ ও পেশায় শিল্প এবং নারী শ্রমিক

বিনিয়োগ ধরন বিশ্লেষণ করে পরিস্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ: বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র, ২০০০।

অর্থনীতিতে উৎপাদনী খাতের অবস্থান প্রান্তিক। সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন সূত্রের তথ্য তো বটেই এমনিতে খালি চোখেও গত ২৮ বছরে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির মূল ধাঁচটা বোঝা সম্ভব। ১৯৭২ সালে জাতীয় আয়ে শিল্পের অংশীদারীত্ব ছিল শতকরা ৯ ভাগের কিছু বেশি। ২৮ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের, পুরনো সংজ্ঞায়, এই অনুপাতের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। পাশাপাশি কৃষির অনুপাত কমেছে। বেড়েছে ব্যবসা-নির্মাণ খাত। এই সময়কালে গার্মেন্টিসসহ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে পুরনো অনেক সরকারী-বেসরকারী শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে নীট শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্য নয়। একই কারণে শিল্প শ্রমিক নামের পেশাটির মধ্যেও জনসংখ্যার তারতম্য হয়নি। এই সংখ্যা গড় পড়তা ৩০ লাখের মতোই আছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার, ২০০০)।

কিন্তু কথাটা এখানেই শেষ করলে হবে না। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, শিল্পশ্রমিক পেশার সংখ্যায় কোন পরিবর্তন না ঘটলেও এর গাঠনিক পরিবর্তন যেটা হয়েছে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন শিল্পশ্রমিকের লিঙ্গীয় গঠন ভিন্ন, নারী শ্রমিকের অনুপাত আগে যেখানে ছিল শতকরা ৫ ভাগেরও কম সেখানে এখন তা শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি। গার্মেন্টস নামক আধাশিল্প আধা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সূত্রেই নারী শ্রমিক পরিচয়ের সামাজিক শক্তি বিশেষভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভালমতো টিকে আছে বা বিকাশমান অবস্থায় আছে সেগুলো হল প্রধানতঃ গার্মেন্টিস, গোপন শিল্প, এবং ক্ষুদ্র শিল্প। গোপন ও ক্ষুদ্র শিল্প অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন। এসব শিল্পের শ্রমিকও প্রধানত নারী। তাছাড়া দোকান, দিনমজুরি ইত্যাদিতেও নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে।[২]

শিল্পায়নের ঘাটতি ও বিকল্প কর্মক্ষেত্র

ঢাকা শহরে একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, শ্রমজীবী নিম্ন আয়ের পেশাগুলোর ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশার আধিক্য খুব বেশি। এর কারণ

২. অধিকতর আলোচনার জন্য, আনু মুহাম্মদ : নারী, পুরুষ ও সমাজ, ১৯৯৮।

অর্থনীতির ধরনের মধ্যেই রয়েছে। আগেই বলেছি, নতুন হওয়া এবং বসে যাওয়া শিল্পগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশে নীট শিল্পায়ন উল্লেখযোগ্য নয় (Task Forces, 1999)। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে একটি শিল্পশ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠা যেমন সম্পর্কিত তেমনি তা প্রকৌশলী, রসায়নবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির মতো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলারও তাগিদ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে শিল্পায়নের দুর্বলতার কারণে নিম্ন আয়ের পেশাগুলো যেমন ভঙ্গুর, অনিশ্চিত, অসংগঠিত অবস্থায় আছে তেমনি মধ্য আয়ের বিশেষায়িত পেশাগুলোও এখানে অনিশ্চয়তা, অসন্তুষ্টি, অকার্যকারিতার মধ্যে আছে। তুলনায় সেসব পেশা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে যেগুলো কালোটাকা, ব্যবসা বা বিদেশী বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মধ্যবিত্ত, ডিগ্রীপ্রাপ্ত তরুণ তরুণীদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে এখন শিল্পায়নের সম্পর্ক তাই খুবই ক্ষীণ। এখন তাই এদের পেশা সম্পর্কিত চিন্তা বা সম্ভাবনায় যে সব ক্ষেত্র সামনে আসে তার মধ্যে বিদেশ গমন এবং এনজিও প্রধান। এনজিও এ যাবত দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি কর্মক্ষেত্র। এনজিওর মধ্যে আবার নানা রকম আছে, ধরন আছে। আয়তন আর ক্ষমতার দিক থেকে অনেক তফাৎ আছে। কিছু এনজিও বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানীজ-এর মতোই। ত্রাণ ও বাণিজ্য এখন একাকার হওয়ায় বহুবিধ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ এখন এনজিওর মাধ্যমেই হচ্ছে। লক্ষাধিক মধ্যবিত্ত তরুণ তরণী এখন এনজিওতেই কাজ করেন।[৩] এনজিওতে পেশার নিশ্চয়তা, কাজের সময় এবং বেতনের ধরন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি। বেতন উপরের দিকে দেশের গড় ধারার তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু নীচের দিকে মোটামুটি অন্য সরকারী সংস্থার মতো বা তার তুলনায় খারাপ। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত কেউ এখানে হয়তো শুরু করেন ৩ থেকে ৪/৫ হাজার টাকা দিয়ে

---

৩. এনজিও কার্যক্রমে বিবর্তন, মেরুকরণ, অগ্রাধিকার পরিবর্তন ইত্যাদির সর্বশেষ চিত্র পর্যালোচনার জন্য দেখুন, আনু মুহাম্মদ: বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল (২য় সংস্করণ), প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

যেখানে সরকারী পদে বেতন কমবেশি ৫ হাজার। কিন্তু উপরের দিকে সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বেতন যেখানে ১৫ হাজার (নির্ধারিত) সেখানে বৃহৎ এনজিও বা ব্যবসায়িক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় এ রকম পর্যায়ের বেতন কার্যত বা শুধু টাকায় ১ লক্ষ অতিক্রম করে। এসব সংস্থায় পেশার অনিশ্চয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি, কর্মঘন্টাও বেশি। এনজিওর মাধ্যমে নিম্নতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত মেয়েদের কর্মসংস্থান তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে, তবে তা প্রধানতঃ গ্রামে।

মেড ইন থেকে মেড এজঃ সুপার মার্কেট থেকে ফুটপাত

বাংলাদেশে বিদেশী পণ্যের যে একচ্ছত্র আধিপত্য আছে তাকে কিছুটা হলেও যারা চ্যালেঞ্জ জানায় তা হল ক্ষুদ্র এবং তথাকথিত গোপন বা বেআইনী শিল্পপ্রতিষ্ঠানই। আমরা আমাদের গবেষণা থেকে দেখেছি যে, যে কোন বিদেশী পণ্য দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গে এর আরেকটি সংস্করণ এখানে বের হয় এবং 'মেড ইন' এর স্থানে 'মেড এজ' ছাপ নিয়ে ওটি বাজারে উপস্থিত হয়। যে মধ্যবিত্ত বিদেশী পণ্য কিনতে পারেন না তারা এটাই কেনেন। ক্রমবর্ধমান হারে আসা বিদেশী পণ্য বাজারজাতকরণে যে রকম একের পর এক নির্মিত হচ্ছে সুপার মার্কেট বা প্লাজা তেমনি সে সবের অনুসৃত দেশী পণ্যের বাজারজাতকরণে সে রকম সম্প্রসারিত হচ্ছে ফুটপাত। দুদিক থেকেই বিক্রেতা পেশায় এখন অনেক মানুষের ভিড়। 'সুপারমার্কেট' বা 'প্লাজা' বা 'দোকান'-এ হচ্ছে কর্মচারী, আর ফুটপাতে হকার। ফুটপাতের হকার আবার নিজেই মালিক নিজেই শ্রমিক। আমাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা দেখেছি, সব সময় এই হকার নামক বিক্রেতারা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে মাস্তানের হামলার ভয়। তটস্থ হকারদের বস্তা নিয়ে লুকানোর চেষ্টা করবার দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়। তাদের বস্তা কেড়ে নেয়া, থানায় নিয়ে তোলা এগুলো নিয়মিত দৃশ্য। মাস্তান ও পুলিশ দু'জায়গাতেই তাদের নিয়মিত খাজনা দিতে হয়। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হকারেরা তাদের দিনের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশি খাজনা হিসেবে দিয়ে থাকেন। এই হার যে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর দেয়ার হারের চাইতে অনেক বেশি।

সারণী ১। বিনিয়োগ: সুপার মার্কেট ও ফুটপাত

বিষয়	ফুটপাতের হকার	সুপার মার্কেট বা প্লাজা
প্রাথমিক পুঁজি বিনিয়োগ	২ থেকে ৫ হাজার টাকা	২ থেকে ১০ লক্ষ টাকা
মাস্তান, পুলিশকে দেয় খাজনা	আয়ের গড়পড়তা ২৫%	আয়ের গড়পড়তা ৫%
ক্রেতা	নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত	মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত
বিক্রয়ের পণ্য	প্রধানতঃ দেশী	প্রধানতঃ বিদেশী
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা	নেই	আছে
অনিশ্চয়তা	সর্বক্ষণ	নেই
পেশা	উদ্যোক্তা-মালিক-কর্মচারী অভিন্ন	উদ্যোক্তা, দোকান কর্মচারী, মার্কেট কর্মচারী

উৎসঃ নিজস্ব অনুসন্ধান

নির্মাণ কাজ ও 'কালোটাকা'র সক্রিয়তা [৪]

গত দু'দশকে বাংলাদেশে নির্মাণকাজের প্রসার হয়েছে বেশ, হাউজিং সোসাইট এখনও ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশ লাভজনকই বটে। এই নির্মাণকাজের প্রসার একদিকে যেমন অবকাঠামো খাতে বিদেশী বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত অন্যদিকে দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্মাণকাজকে অনেক সময়ই শিল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই শব্দের পাইকারি ব্যবহারে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণ অস্পষ্টতায় আক্রান্ত হতে পারে। এটি পরিস্কারভাবে বলে দেয়াই ভালো, নির্মাণকাজ এর ধরন আলাদা। অন্যান্য শিল্পের (ম্যানুফ্যাকচারিং) সঙ্গে তাকে মেশানো ঠিক নয়।

নির্মাণকাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী, রডমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী পেশায় যে রকম লোক বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে স্থপতি ও প্রকৌশলী পরিচয়ের মানুষও। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য বর্তমান হারে আগে কখনও ঢাকায় নির্মাণ

৪. প্রচলিত অর্থে এখানে 'কালোটাকা' বলা হয়েছে। এই শব্দের ভেতর যে বর্ণবাদী সুর আছে তা থেকে মুক্ত থাকবার জন্য 'দুর্বৃত্ত অর্থনীতি' বলা শ্রেয়।

কাজ হয়নি, এই হারে বহুতল ভবনও আগে তৈরি হয়নি। নির্মাণকাজ তাই এখন সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। নির্মাণ ফার্ম, আর্কিটেচারাল ফার্ম এখন বিকাশমান ক্ষেত্র। ঠিকাদারী এখন ব্যক্তিগত পেশার চাইতে অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক। আগে নির্মাণের ডিজাইন থেকে শুরু করে ফিনিশিং পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে এক রাজমিস্ত্রীই করতো, এখন তা নেই। কাজ বড় হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদী, যৌথ মালিকানায়, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে। শ্রম বিভাজনও গভীর হয়েছে। অনেক পেশার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

শুধুমাত্র নির্মাণেই শেষ নয়, নির্মাণের পর ঘর সাজানোর ব্যাপারটিও ক্রমেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে যাচ্ছে। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর এখন একটি টেকসই পেশা। হাউজিং বা সুপারমার্কেট ছাড়াও ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোটি টাকার বাড়ি নির্মাণের ঘটনা খুব সুলভ। এখন লক্ষ টাকায় বাড়ি ভাড়াও হচ্ছে। এসব বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে যে মালিকেরা জড়িত তাদের অধিকাংশের আয়ের অনুসন্ধান করতে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে আয়-উপার্জনের আরেক জগৎ, যাকে এক কথায় 'কালো অর্থনীতি' বলে। বিভিন্ন হিসাবে বাংলাদেশের বার্ষিক মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩০ শতাংশ এই অর্থনীতিতে তৈরি হচ্ছে যা জাতীয় আয়ের হিসাবে আসে না (UNDP, 1999)।[৫] বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে এর সর্বব্যাপী প্রভাব সে কারণে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এই অর্থনীতি যে ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতা থেকে হয় সেগুলো হল: মাদক, অস্ত্র, পর্ণোগ্রাফিসহ বিভিন্ন পণ্য চোরাচালানী ও কালোবাজারী (অন্য ভাষায় বেআইনী আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য)। বিদেশী সংস্থাসমূহের বিনিয়োগ সুবিধা দেবার জন্য সরকারী প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে বিপুল ঘুষ, বিদেশী সাহায্য ভাগ বাঁটোয়ারা, ওভার ও আন্ডার ইনভয়েসিং, সরকারী উন্নয়ন বাজেট লোপাট, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ, যৌন ব্যবসা ও নারী পাচার, দালালী, ছিনতাই-ডাকাতি, ইত্যাদি।

---

৫. সম্প্রতি সমাপ্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ এবং বিশেষ বক্তৃতায় রেহমান সোবহান অর্থনীতির এই প্রবণতার ক্রমবিস্তারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আসাদুজ্জামান গোপন অর্থনীতির উপর গবেষণা কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এইসব তৎপরতা দিয়ে জিডিপি বাড়ে। জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নও সেজন্য এখন জোরদার হচ্ছে।

এসব তৎপরতার লাভজনক অবস্থার ফলে এগুলোকে ঘিরে নানা পেশা দাঁড়াচ্ছে এবং সম্পর্কিত পুরনো অনেক পেশাও নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। যেসব সরকারী পেশা কালোটাকা উপার্জনের জন্য সুবিধাজনক সেগুলোতে ভিড় বাড়ছে। তাছাড়া সন্ত্রাসী, মাস্তানের চাহিদাও এই অর্থনীতির প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবেই বাড়ছে। 'কালো' টাকা সাদা করবার জন্য দেশে-বিদেশে বাড়ি বানানো, জমি কেনা, চাঁদা বা রাজনীতিতে বিনিয়োগ, চলচ্চিত্র তৈরি ইত্যাদি পথ সুবিধাজনক। সে কারণে বিনিয়োগের পথ ধরে সেই অনুযায়ী পেশাও তৈরি হচ্ছে।

প্রকৃত আয়ের অবনতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বাণিজ্যে বসতি

এমনিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক এবং সরকারী-আধা সরকারী-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়মিত বেতনের প্রকৃত চেহারা হিসাব করলে একটা ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর গত ২৮ বছরে সাধারণভাবে শ্রমিকদের এবং সরকারী-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সরকারী স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনে প্রকৃত আয় বাড়েনি বরঞ্চ ৭১-৭২ কে ভিত্তি করে হিসাব করলে প্রকৃত আয় কমেছে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট বেতনভুকদের মধ্যে অন্য আয় সন্ধান বেড়েছে। একই কারণে পরিবারের নারী সদস্যদের উপার্জনী কাজে অংশগ্রহণ করবার হার অনেক বেড়েছে। অন্যদিকে স্কুল কলেজের শিক্ষকদের টিউশনি, কোচিং সেন্টার, নোটবই লেখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ঠিকাদারী গবেষণার দাপট নিয়মিত দায়িত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু এসব উপরি আয় গ্রহণ সবাই করছেন না বা করতে পারছেন না।

কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম ইত্যাদি এখন স্কুল-কলেজের চাইতে বেশি সচল। একজন শিক্ষক যেখানে স্কুল বা কলেজ থেকে বেতন পাচ্ছেন ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা, সেখানে টিউশনি, নোটবই বা কোন কোচিং সেন্টারে যুক্ত থেকে তিনি আয় করছেন ২০ থেকে ৩০ হাজার। এঁদের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের দাপটে স্কুল-কলেজের স্বাভাবিক গতি অস্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বেতন পেতে পারেন যেখানে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা, কনসালট্যান্সীতে

সেখানে আয় হবে ৩০ থেকে ৭০/৮০ হাজার কখনো কখনো লক্ষাধিকও। কাজেই এসব পেশার দ্রুত বৃদ্ধি, এগুলোতে ভীড় বৃদ্ধি পাবারই কথা। তাছাড়া, গবেষণা খাতে তহবিলের প্রবাহ বেশ আকর্ষণীয়। দারিদ্র থেকে নারী- ইত্যাদি বিষয়ে তহবিল দাতাদের আগ্রহ এখানকার 'গবেষক'-শিক্ষকদের উল্লাস ও উদ্দীপনার অন্যতম অবলম্বন। এগুলোতে কাজ যাই হোক সমাজে নতুন পেশা ও তৎপরতা সৃষ্টিতে এগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেসরকারী উচ্চ ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এর চাহিদা এবং এর ব্যবসাযোগ্যতা দুই কারণেই। এসব কারণে বিদ্বৎসমাজকে ঘিরে বা বিদ্বৎসমাজকে নিয়ে বাণিজ্যিক জগৎ আগের যে কোন সময়ের তুলনায় জমজমাট। কোচিং সেন্টার থেকে গবেষণা ফার্ম কিংবা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সবই শতকরা ১০০ ভাগ বাজারের টানেই পরিচালিত। পেশাও তাই গঠিত হচ্ছে সেভাবেই।

একই ঘটনা ডাক্তারদের বেলাতেও সত্য। সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারের বেতন একই রকমভাবে প্রকৃত অর্থে কমেছে। এসব হাসপাতালেরও জীর্ণদশা। পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে বাণিজ্যিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার। শিক্ষা-স্বাস্থখাতে বিদেশী বিনিয়োগও হতে যাচ্ছে।

স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রসারের সঙ্গে বিদেশ গমন ও বর্তমানে চাকরি চাহিদার ধরন সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্মানবোধের সাথেও যুক্ত। চাহিদা ও যোগান দুদিক থেকেই এগুলো প্রসারমান।

পরিবহণঃ নতুন ও পুরনো

পরিবহণ-এর মধ্যে বিশেষভাবে সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে গত দুদশকে। আন্তঃজেলা যাত্রীবাহী বাস দুই দশকের ঘটনা, এর আগে ট্রেনই ছিল আন্ত:জেলা প্রধান পরিবহণ। গত কয়েক বছরে বিলাসবহুল বাস নগর পরিবহণ ও আন্ত:জেলা পরিবহণ দুক্ষেত্রেই স্বাভাবিক

ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পরিবহণ খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে অনেক। বাস-ট্রাকের আমদানীও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। মিনিবাসও। সাথে সাথে বাস-ট্রাক এর বডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে ড্রাইভার, কন্ডাক্টর পেশার মানুষ। কন্ডাক্টর, হেল্পার বলে যে পদগুলো আছে সেগুলোতে প্রধানতঃ শিশু-কিশোররাই কর্মরত। বেতন এখানে নেই কিংবা যৎসামান্য। নিরাপত্তা বা নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার কথা অবান্তর।

গত দু'দশকে বিশেষতঃ ৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে খুবই দ্রুত হারে। এর সঙ্গে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প, এনজিও, ঋণখেলাপী, বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ যোগ আছে। গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ড্রাইভার, মেকানিক ইত্যাদি পেশার চাহিদাও বেড়েছে। ঢাকার জনপরিবহণে ইদানিংকালে যুক্ত হচ্ছে ট্যাক্সি, ম্যাক্সি, এসি বাস ইত্যাদি। এক সময়ে বিকল্প ট্যাক্সি চালু হয়েছিল। একে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রীপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের 'নতুন দিগন্ত' বলে উল্লেখও করা হয়েছিল তখন। বিভিন্ন কারণে টেকেনি। এখন আবার ট্যাক্সি চালু হচ্ছে, তবে সেভাবে নয়।

যাত্রীসংখ্যা বিবেচনা করলে রিকশা এখনও ঢাকার প্রধান পরিবহণ। আইনী-বেআইনী বিভিন্নভাবে রিকশা চলছে। রিকশার সঙ্গে সম্পর্কিত পেশা ও মানুষের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। ঢাকা শহরের রিকশার সঙ্গে যুক্ত আছে যে পেশাগুলি সেগুলো হলোঃ বডি নির্মাতা, শিল্পী, চালক (চলতি কথায় রিকশাওয়ালা), মেকানিক, গ্যারেজ দেখাশোনাকারী প্রভৃতি। শুধুমাত্র ঢাকায় রিকশার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ এঁরা সবাই মিলে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা এখন ১৫ লাখেরও বেশি। বছরে রিকশার মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় ৭০০০ কোটি টাকার 'মূল্য' তৈরি হয়, ঢাকায় এর পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটি টাকা।[৬] ঢাকায় একদিকে যেমন রিকশা ও রিকশাচালকের সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি রিকশার আরোহীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিকশা এখন গ্রাম থেকে স্থায়ীভাবে উঠে আসা কিংবা অস্থায়ীভাবে কাজ করতে আসা মানুষদের জন্য একটি উন্মুক্ত কর্মক্ষেত্র।

---

৬. বিবিএস প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরীপ, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, সিটি কর্পোরেশন ও নিজস্ব অনুসন্ধান থেকে হিসাবকৃত।

তথ্য প্রযুক্তি ও বিনোদন সাম্রাজ্য

তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশে এখন বাংলাদেশ সরাসরি যুক্ত। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা একইসঙ্গে পেশার গঠনকেও প্রভাবিত করেছে। এই সুবিধা এখন ক্রমেই গণরূপ নিচ্ছে। আগে যেখানে এই সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হতো লক্ষ টাকার বেশি সেখানে এখন তা ২০০ টাকাতেই পাওয়া সম্ভব। ঢাকা শহরের প্রতিপাড়ায় এজন্য সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে ক্ষুদ্রায়তনে এসব উদ্যোগ ছিল, ক্রমে এর মধ্যেও দ্রুত উঠানামা হয়েছে এবং যৌথ সংস্থা বা একচেটিয়া সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভিডিও দোকানের ব্যবসা এক সময় বেকার তরুণদের আকর্ষণীয় পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন তা নেই। যারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকে এখন ডিশব্যবসায় এসেছেন, যদি এখনও বিদেশে না গিয়ে থাকেন।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফোন-ফ্যাক্স চালু হয়েছে ৯০ দশকেরই প্রথম দিকে। গত বছরখানেকের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ই-মেইল চালু হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য, আত্মীয়স্বজনদের চাকুরি, পড়াশোনা, বসতিস্থাপন ইত্যাদি এদিকে যে যোগাযোগের তাগিদ তৈরি করেছে সেটা পূরণ হচ্ছে এই সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আবার এই সুবিধার কারণে যোগাযোগের নতুন ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে। বিনোদন বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার হয়েছে একই সময়ে।

বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং সেই সঙ্গে বিপণনের নানাবিধ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মডেলিং পেশাও এখন আকর্ষণীয় পেশা হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। ফ্যাশন, ডিজাইন ইত্যাদি এখন আগের তুলনায় মধ্যবিত্তের বড় মনোযোগের বিষয়। এনজিও নির্ভর হস্তশিল্প সামগ্রীর দোকানগুলো এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। রূপচর্চা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিউটি পার্লার, প্রসাধন সামগ্রী, কনসালট্যান্সী ইত্যাদির বাজার এখন বেশ জমজমাট। এগুলোর পাশাপাশি প্যাকেজ সংস্কৃতি অডিও-ভিডিও তৎপরতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এটাকে কেন্দ্র করেই। বেসরকারী টিভি চ্যানেল, স্যাটেলাইট বাংলা চ্যানেল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগুলো আরও বিকশিত হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু এই সঙ্গে এটা অন্ততঃ উল্লেখ করা দরকার যে, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন, রূপচর্চা, স্যাটেলাইট চ্যানেল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ বিশেষতঃ ভারতীয়

বিভিন্ন সংস্থার সংযুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে ঘটতে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশী-বিদেশী মিলিয়ে শুধু বিজ্ঞাপন খাতেই মোট বিনিয়োগ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি।[৭]

ধর্মীয় পেশাজীবী

গত দু'দশকে ধর্ম-নির্ভর পেশার আয়তনও বেড়েছে। এর নতুন মাত্রাও যোগ হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাগুলো সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে আমরা এক কথায় ধর্মীয় পেশাজীবী বলতে পারি। আমরা সরকারী পরিসংখ্যান থেকে দেখি, গত দু'দশকে সরকারী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় তেমন না বাড়লেও মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে ৭গুণ (BANBEIS, 1974, 1981, 1991; মুতি, ১৯৯৬)। এছাড়া একই সময়কালে সাধারণ স্কুলেও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা চালু হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করবার পেছনে ধর্মের চাইতে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিই যে বেশি কার্যকর ছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে এর মধ্য দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হয়েছে। এমনিতে গরীব পরিবারের ছেলেরাই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। কাজেই এই শিক্ষার পর সারাদেশে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের সমস্যার মুখে এটা কর্মসংস্থানের বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোতে নিয়োজিত আছেন প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষক এবং স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক আছেন ১ লক্ষেরও বেশি। এছাড়া আছেন ইমাম, মুয়াজ্জিন; মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার ব্যবস্থাপনার ব্যক্তিবর্গ। বর্তমানে অডিও-ভিডিও প্রযুক্তিও ধর্মীয় পেশাজীবীরা ব্যবহার করেন। অনেকগুলো এনজিও রাজনৈতিকভাবেই ধর্মীয় পেশার ব্যক্তিদের যুক্ত করে কাজ করতে চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমী দেশগুলো থেকে ধর্মীয় প্রচার ও রাজনীতির জন্য যে তহবিল আসে তা এক্ষেত্রে তৎপরতা অনেক বাড়িয়েছে।

মাসিক আয়, জাতীয় গড় ও ঢাকার বিভিন্ন পেশার অবস্থান

বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যয় জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন আয় পর্যায়ে দেশের, শহর এবং গ্রামের, শতকরা কত ভাগ মানুষ অবস্থান করেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় (সারণী ২)। আমরা এখানে সেই তথ্যের সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধান থেকে

---

৭. নিজস্ব অনুসন্ধান, বেসরকারি হিসাবের উপরই এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয়েছে। কেননা এখানে সরকারের কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। সূত্র : বিভিন্ন বিজ্ঞাপণী সংস্থা।

প্রাপ্ত সেই আয়ভুক্ত ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশা নির্দেশ করছি। জাতীয় হিসেবে দেখা যাচ্ছে মাসে ৮০০০টাকার বেশি আয় এরকম জনসংখ্যা শতকরা মাত্র ৪.১ ভাগ (BBS, 1998)। মাসে ৮০০০ টাকার বেশি আয়ের যে সব পেশা আমদের অনুসন্ধানে এসেছে তাদের মধ্যে ৮০০০ টাকার অনেক বেশি মাসিক আয়ের পেশা রয়েছে। সুতরাং ৮০০০ টাকার বেশী আয়ের পেশাগুলো আমরা আলাদা করেই দেখাচ্ছি।

সারণী ২। পেশা ও আয়ের বিন্যাস

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
<১০০০	১০.৬	৩.৪	গৃহশ্রমিক, চকোলেট বিক্রেতা, গার্মেন্টস শ্রমিক, রেস্তোরাঁ 'বয়', দোকান-নার্সারি-আড়তের কর্মচারী, লেদমেশিন শ্রমিক, বেসরকারি স্কুল শিক্ষক, গৃহশিক্ষক, টোকাই, কালা সাবান বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা..
১০০০-২০০০	৪২.৩	২৫.৪	রুটির কারিগর, রিকশাচালক, রিকশা মেকানিক, ফুলের দোকান শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, মাজারের খাদেম, ঝাড়ুদার, স্কুল শিক্ষক, মসজিদ সহকারী, সুরমা বিক্রেতা, বেকারি কর্মচারী, বেসরকারী স্কুল শিক্ষক, মাঠা বিক্রেতা, কুলি, সুইপার, রিকশা শিল্পী, টিয়া পাখী স্বাস্থ্য দেখা, হস্তসামগ্রীর দোকানের 'সেলস গার্ল'।
২০০১-৩০০০	২০.৯	২২.৫	দোকান ম্যানেজার, ছোট দোকানদার, ফল বিক্রেতা, জুতা পালিশ, ফেরীওয়ালা, মসজিদের চাঁদা আদায়কারী, কম্পিউটার অপারেটর, খাবার দোকানের কর্মচারী, মসজিদ কেয়ারটেকার, বেসরকারী হাসপাতালের নার্স, সরকারী হাসপাতালে সিনিয়র আয়া, কিন্ডারগার্টেন-কোচিং সেন্টারের শিক্ষক, গৃহ শিক্ষক, দারোয়ান।

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
৩০০১-৪০০০	১০.১	১৪.৫	বাসের কন্ডাক্টর, টেম্পো ড্রাইভার, বুট বিক্রেতা, চা-দোকানদার, পত্রিকার হকার, ঠেলাগাড়ি চালক, ভ্যানগাড়ি চালক, আইসক্রিম বিক্রেতা, ছাতা মেরামতকারী।
৪০০১-৫০০০	৬.০	১০.১	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারী হাসপাতালের নার্স, ছোট দোকানদার, নির্মাণ শ্রমিক, কাঠমিস্ত্রী, গৃহশিক্ষক।
৫০০১-৬০০০	৩.১	৫.৯	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, 'যৌন শ্রমিক', বেবীট্যাক্সি চালক, বেসরকারী এয়ার হোস্টেল, হাড়িপাতিল বিক্রেতা, মুদি দোকানদার, রডমিস্ত্রী, নার্সারির মালিক, ম্যাক্সি চালক, মানি চেঞ্জার।
৬০০১-৮০০০	২.৯	৬.৯	সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাস ড্রাইভার, মাটির জিনিষের ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, সাংবাদিক।
৮০০০+	৪.১	১১.৩	৮০০১-১০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ-স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাস ড্রাইভার, মাটির জিনিষের ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, সাংবাদিক। ১০০০১-১৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গাড়ি মেকার, চানাচুর ফ্যাক্টরীর মালিক, ঘটক, ফোন-ফ্যাক্স দোকানের মালিক, ডিশ ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী কলেজ, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, ট্রাক চালক।

মাসিক আয় (টাকা)	সারা দেশে এই আয়ভুক্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	সকল শহরে এই আয়ভুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হার	ঢাকা শহরে এই আয়ের পেশাসমূহ
৮০০০+	৪.১	১১.৩	১৫০০১-২০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, মাছের আড়তদার, ডাক্তার, কোচিং সেন্টারের অংশীদার, বই দোকানের মালিক, ফ্যাক্স মেইল দোকানের অংশীদার, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ২০০০১-৩০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ জুয়ার মালিক, বেসরকারী উচ্চ বেতনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, আইনজীবী। ৩০০০১-৫০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা, বড় বেকারীর মালিক, ঠিকাদার। ৫০০০১-৭৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থার কর্মকর্তা, ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক, দেশীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা। ৭৫০০১-১০০০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ঃ গবেষক-কনসালট্যান্ট, এনজিও কর্মকর্তা, বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা। ১০০০০০+টাকা আয়ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থা ও বৃহৎ এনজিও-র প্রথম সারির কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, গবেষণা-নির্মাণ সংস্থার অংশীদার মালিক, ঠিকাদার, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দালাল (লবিষ্ট)।

উৎস ঃ বিবিএস (১৯৯৮) পারিবারিক ব্যয় জরিপ, ১৯৯৬ ও নিজস্ব অনুসন্ধান।

ঘন্টা প্রতি আয়

ঘন্টা প্রতি আয় মাসিক আয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত চিত্র থেকে ভিন্ন হয় তখনই যখন কর্মঘন্টা ও অবস্থার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত বা প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরেরা সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ, কর্মজীবী নারী-পুরুষ, সাপ্তাহিক ছুটিকে বিলাসিতা বা কর্মহীনতা হিসেবেই দেখে থাকেন। কেননা, তাদের জন্য একদিনের ছুটি মানে একদিনের কাজের পয়সা বাদ দেয়া। কাজের ঘন্টাও তাঁদের অনেক দীর্ঘ। ৮ ঘন্টা শ্রম দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক মানুষই ৮ ঘন্টা কাজ করে প্রয়োজনীয় জীবিকা অর্জন করতে পারেন। তাছাড়া নির্দিষ্ট আয়ভোগীদের প্রকৃত আয় কমে যাবার ফলে তাদের বাড়তি সময় কাজ করেই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। এভাবে পরিস্থিতির কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মঘন্টা বেড়ে যায়। নীচে ঘন্টা প্রতি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পেশার মানুষেরা কত আয় করেন তার একটি চিত্র দেওয়া হল। যারা কোন নগদ টাকা পান না, শুধু পেটেভাতে অর্থাৎ থাকা খাওয়ার বিনিময়ে কাজ করেন তাদের আয়ও ২ টাকা পর্যন্ত হিসেবে ধরা হচ্ছে।

- ২ টাকা পর্যন্তঃ গৃহশ্রমিক, চকোলেট বিক্রেতা, গার্মেন্টস শ্রমিক, রেস্তোরাঁ 'বয়', দোকান-নার্সারি-আড়তের কর্মচারী, লেদমেশিন শ্রমিক, মুদি দোকানের কর্মচারী, টোকাই।
- ২.১ থেকে ৫ টাকাঃ বেকারির কারিগর, রিকশা মেকানিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গাঁজা বিক্রেতা, ভ্যানচালক, চকোলেট বিক্রেতা, প্রাইভেট ড্রাইভার, দোকান কর্মচারী, মসজিদ সহযোগী, আড়তের কর্মচারী, কুলি, নার্সারি কর্মচারী, সুইপার, ফুটপাতের দোকান সহযোগী, টিয়া পাখী ভাগ্যদেখা, মাজারের খাদেম, ভ্যানচালক, কালা সাবান বিক্রেতা।
- ৫.১ থেকে ৭.৫ টাকাঃ ফুল দোকানের শ্রমিক, ছোট দোকানদার, খাবার দোকানের কর্মচারী, চকোলেট-ফুল-পত্রিকা বিক্রেতা, বেসরকারী স্কুল শিক্ষক, জুতা সেলাই-কালি, রিকশা-শিল্পী, হকার।
- ৭.৬ থেকে ১০ টাকা ঃ রিকশাচালক, বাস কন্ডাক্টর, বুট বিক্রেতা, ঝাড়ুদার, সুরমা বিক্রেতা, দারোয়ান, ঠেলাগাড়ি চালক, মাঠা বিক্রেতা, ম্যাক্সিচালক,

ফেরীওয়ালা, মসজিদের চাঁদা আদায়কারী।

- ১০.১ থেকে ১৫ টাকাঃ টেম্পো ড্রাইভার, হস্তশিল্প দোকানে 'সেলস গার্ল', কাঠমিস্ত্রী, কম্পিউটর অপারেটর, ফল বিক্রেতা।
- ১৫.১ থেকে ২০ টাকাঃ বাস ড্রাইভার, স্কুল শিক্ষক, বেবীট্যাক্সি চালক, হাড়িপাতিল বিক্রেতা, মানি চেঞ্জার।
- ২০.১ থেকে ৩০ টাকাঃ সরকারী কর্মকর্তা, বিমানে ট্রাফিক এসিস্ট্যান্ট, ভাসমান যৌন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক।
- ৩০.১ থেকে ৫০ টাকাঃ এনজিও কর্মকর্তা, কোচিং সেন্টারের অংশীদার, মাটির জিনিসের ব্যবসায়ী, ফেনসিডিল ব্যবসায়ী, ট্রাক চালক, ইনটেরিয়র ডেকোরেটর।
- ৫০.১ থেকে ৭৫ টাকাঃ ছিনতাইকারী, প্যাথিড্রিন ব্যবসায়ী, লেদ দোকানের মালিক, ইন্টারনেট কর্মী, ডিশ এন্টেনা, ফ্যাক্স-ই-মেইল ব্যবসায়ী।
- ৭৫.১ থেকে ১০০ টাকাঃ জুয়ার মালিক, ফ্যাক্স-ই-মেইল ব্যবসায়ী।
- ১০০+ টাকাঃ ফুল দোকানসহ বড় দোকান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক, বৃহৎ দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

মাসিক আয় থেকে আমরা ঢাকার বিভিন্ন পেশার অবস্থান সম্পর্কে যে চিত্র পাই তা আরও পরিস্কার হয় যখন আমরা তা থেকে ঘন্টা প্রতি আয় বের করি। যাদের কর্মঘন্টা বেশি তাদের মাসিক আয় বেশি হলেও যাদের কর্মঘন্টা কম তাদের তুলনায় ঘন্টাপ্রতি আয় কমে যেতে পারে। আমরা আমাদের বিশ্লেষণে সে রকম ফলাফলই পেয়েছি। কিন্তু সঠিক চিত্র পেতে গেলে আয় ছাড়াও আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করা দরকার। আয় বেশি হলেও নিরাপত্তহীনতা, সামাজিকগ্রহণযোগ্যতা, নিপীড়নমূলক অবস্থা, সাপ্তাহিক ছুটি ইত্যাদি বিবেচনা করলে কোন কোন পেশার অবস্থান অনেক নীচে নেমে যেতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণে 'যৌনশ্রমিক' বা 'পতিতা' মাসিক আয়ের দিক থেকে অনেকগুলো পেশা থেকে উপরে অবস্থান করে, কিন্তু তার নিরাপত্তাহীনতা, তার নির্যাতনমূলক অভিজ্ঞতা, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি উপর ক্রমবিশ্লেষণ করলে তার অবস্থান দাঁড়ায় সবার নীচে।

একদিকে আয়, অন্যদিকে আয়ের সঙ্গে উপরোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করলে অনেক পেশার অবস্থানই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

বিশ্বায়নের যোগসূত্র

উপরের প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যালোচনা থেকে আমরা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি যে, আইনী-বেআইনী ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং পেশাই গত দু'দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার যেগুলোতে আয় বেশি,অস্ত্র-মাদকদ্রব্য ব্যবসা বাদে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, যোগাযোগ ও বিদেশী সাহায্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহৎ নির্মাণ ফার্ম, বৃহৎ আইন ফার্ম, ঠিকাদারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স, কম্পিউটার, সুপার মার্কেট, বিদেশী ডাক্তার ও বিনিয়োগ সম্বলিত ক্লিনিক, স্পোকেন ইংলিশ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ, বায়িং হাউজ, হস্তশিল্প বিপণন, এনজিও, ভিসা-ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা, রফতানিমুখি দেশি-বিদেশি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিদেশী মুদ্রা ও হুন্ডি ব্যবসা ইত্যাদি এর কিছু উদাহরণ। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এ ধরনের পেশার বিকাশ খুবই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বিশেষত্ব হল এই যে, এগুলোর দেশীয় খুঁটি খুব দুর্বল।

নিম্ন ও উচ্চ আয়ের অনুপাত

নিম্ন ও উচ্চ আয়ের সীমা এখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। শুধুমাত্র পেটেভাতে কাজ করবার মতো পেশা ২৫/৩০ বছর আগে বা তারও আগে যেমন ছিল, এখনও আছে। সরকারী চাকুরিতে সর্বনিম্ন আয় ৭২ সালে ছিল কমবেশি ১০০ টাকা, সর্বোচ্চ ছিল ১৫০০ টাকা; এখন তা যথাক্রমে ১০০০ ও ২০০০০ টাকা। আয় অনুপাতের ধরন ১:১৫ থেকে ১:২০ হয়েছে। কিন্তু ২৫ বছর আগের তুলনায় বাড়তি বা উপরি আয়ের সম্ভাবনা বেড়েছে অনেক। সরকারী উচ্চপদে যারা থাকেন তাদের পক্ষে লক্ষ টাকার বাস্তব আয় তৈরি করা খুবই সম্ভব। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, কর, পুলিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। সে হিসেব অন্তর্ভুক্ত করলে ব্যবধান আরও বাড়বে।

সারণী ৩ । ন্যূনতম আয় ও উচ্চ আয়ের বিন্যাস

সন	ন্যূনতম আয় ও উচ্চ আয়ের বিন্যাস			
	ন্যূনতম আয়-১	ন্যূনতম আয়-২	উচ্চতম আয়	উচ্চতম ও ন্যূনতম আয়-২ এর অনুপাত
১৯৭২	পেটে-ভাতে	১০০ টাকা	১৩০০০ টাকা	১:১৩০
১৯৯৮	পেটে-ভাতে	৫০০ টাকা	২০০০০০ টাকা	১:৪০০

উৎস ঃ নিজস্ব অনুসন্ধান

বেসরকারী খাতে ন্যূনতম মজুরি বলে কিছু নেই, গার্মেন্টসে ৫০০ টাকা বেতনেও অনেকেই কাজ করছেন। অন্যদিকে বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ এনজিও, গবেষণা, নির্মাণ, বিদেশী সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ টাকার নিয়মিত চাকরি এখন দুর্লভ নয়। দু'লক্ষ টাকার চাকরির সংখ্যা কম কিন্তু আগের যে কোন সময়ের তুলনায় দৃশ্যমান। এনজিও প্রধান, গ্রুপ অব কোম্পানজী-এর পরিচালক-মালিকদের আয়ের বিষয়ে কোন সীমা চিহ্নিত করা কঠিন। এদের আয় টাকার অংকে যত তার থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশে আয়করের চিত্র দেখলে অবশ্য এসব উচ্চ আয়ের মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। বেসরকারি খাতে এখানে নিম্ন-উচ্চ আয়কে একটি সীমার মধ্যে বিবেচনা করলে অনুপাত দাঁড়ায় কমপক্ষে ১ : ৪০০।

ব্যয়ধরনের পরিবর্তন ও নতুন গতিমুখ

উচ্চ আয়ের বিভিন্ন পথ তৈরি হবার ফলে ভোগের ধরনেও তার প্রভাব পড়েছে। ব্যয়বহুল খাবার দোকান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা এভাবেই বিস্তৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার গত দু'দশকে একারণেই অভূতপূর্ব হারে বেড়েছে। চিকিৎসা বা বেড়াতে যাবার জন্য ভারত এই জনগোষ্ঠীর জন্য কোন বিশেষ ব্যাপার নয়, সিঙ্গাপুর বা ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা যেতে পারবার মতো লক্ষাধিক পরিবার বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে গত দু'দশকে।

অন্যদিকে এক ব্যক্তির আয়নির্ভর মধ্যবিত্ত এখন আর অটুট নেই। নিয়মিত

কাজে প্রকৃত আয় কমে গেছে। দু'তিনজন কাজ করে সংসার সামলানোর চেষ্টা করছেন। এর মধ্য দিয়েই শ্রমবাজারে মধ্যবিত্ত নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এর মধ্যে ভোগ তালিকায় নতুন নতুন অনেক পণ্য যোগ হয়েছে। ব্যয় বেড়েছে। চারদিকে কেনার দ্রব্যের যোগান, বিজ্ঞাপনের প্রসার ও ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার জন্য মধ্যবিত্ত নানাভাবে পরিকল্পনা করতে থাকে। উপরি আয়ের নানাপথ এখন আর সামাজিকভাবে নিন্দনীয় নয়। কোনভাবে দাঁড়াতে না পারলে, বা আরও ভালভাবে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মধ্যবিত্ত বাইরের বিশ্বের দিকে ছুটতে চেষ্টা করে। পয়সা নিয়ে খোঁজ খবর নেয়া, ফরম পূরণ করা, তদবির করা, রাস্তা দেখানো ইত্যাদি কাজেও পেশা তৈরি হয়েছে।

বাইরে গিয়ে অনেকেই পরিবারের ব্যয়ধরনকে পাল্টে দিয়েছেন, আরও অন্য সদস্যদের মধ্যেও বিদেশ যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। বাইরে গিয়ে আবার দেশে ফিরে নতুনভাবে নিজের পেশা দাঁড় করাচ্ছেন এরকম মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি দেখা যায়। বাইরে ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করে দেশে এসে সে রকম নিজেই একটা দোকান দিচ্ছেন এরকম উদাহরণ ঢাকায় অনেক পাওয়া যাবে। ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় পড়ে সেখানকার কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে বা উপদেষ্টা হিসেবে এদেশে কাজ করছেন এরকম ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

শহরমুখী যাত্রা ও পেশার ভাঙন-গঠন

পাশাপাশি ঢাকায় ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ গ্রাম থেকে উঠে আসছেন। উঠে আসছেন উচ্ছেদ হয়ে বা কাজের খোঁজে নিম্ন আয়ের নারী-পুরুষ। এসব পরিবারের মেয়েরাই নারী শ্রমিক হিসেবে ঢাকা শহরের চেহারা পাল্টে দিচ্ছেন। ফুটপাত তাদের প্রথম আশ্রয়। কয়েকলক্ষ মানুষ এখন ঢাকার ফুটপাতেই থাকেন। পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে সম্পর্ক, ধ্যান-ধারণা। শ্রমিক মেয়েরা অনেকেই একসঙ্গে মেস করে বা বস্তিতে ঘর নিয়ে থাকেন। তাদের উপর মালিক থেকে মাস্তান পর্যন্ত বিভিন্ন জনের হামলা এমনকি খুন নিয়মিত ঘটনা।

সরকারী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা শহরে এখন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি মানুষ। এদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে উঠে আসা যেখানে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এই মর্মে সারা বিশ্বে প্রচারণা আছে। অন্য দিকে গ্রাম থেকে বা মফস্বল শহর থেকে আসছেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত। অধিক প্রতিষ্ঠা, ইজ্জত বা বিদেশ পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে। ঢাকার সঙ্গে ঢাকার বাইরের শহরগুলোর সুযোগ-সুবিধার তফাৎ এতই যে, ঢাকায় আসার যুক্তিটা সবার ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়।

উপসংহার

আমাদের অনুসন্ধানে আমরা পরিস্কারভাবে দেখছি যে, একদিকে পুরনো অনেক পেশা ভাঙছে অন্যদিকে নতুন অনেক পেশা গড়ে উঠছে। লক্ষ্যণীয় যে, নতুন পেশাগুলোর সঙ্গে দেশীয় উৎপাদনশীল ভিত্তির সম্পর্ক ক্ষীণ। দেশীয় তৎপরতায় যে পেশাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো তুলনায় অনেক ভঙ্গুর। স্থায়ী পেশাগুলোর প্রকৃত আয় কমেছে কিন্তু বাড়তি আয়ের পথ খুলেছে অনেক। এক ব্যক্তির আয়ভিত্তিক পরিবার অনেক কমে এসেছে এবং অন্যদিকে আয়-উপার্জনমূলক কাজে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দু'ক্ষেত্রের নারীরই অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে।

পেশাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশেও তা চলছে, চলবেও। তবে এর ধরন ও গতিমুখই হল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অর্থনীতির যে ধরন বর্তমানে চলছে তাতে পরিবর্তন আরও হলেও গতিমুখের আশু কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আমাদের গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা ঢাকা শহরে এর কেন্দ্রীয় চেহারাটাই দেখেছি, যেখানে গতি ও বৈপরীত্য একই সঙ্গে বাড়ছে।

টীকা ঃ এই গবেষণায় প্রবন্ধকারের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন : তাসলিমা আখতার, ফারজানা রহমান, হানিফ দেওয়ান, সোহেল আহমেদ, আবদুল আলী, ইফতেখার আহমেদ, ফিরোজ আহমেদ, শামীমা আখতার, জাহিদুন্নবী। প্রবন্ধকার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

তথ্য নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০) *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

মুতি, আব্দুল্লাহ আল (১৯৯৬) *আমাদের শিক্ষা কোন পথে।* ঢাকা।

BANBEIS (1974) *Bangladesh Educational Statistis.* Dhaka : BANBEIS.

BANBEIS (1985) *Bangladesh Educational Sratistics.* Dhaka: BANBEIS.

BANBEIS (1991) *Bangladesh Educational Statirtics.* Dhaka : BANBEIS.

Task Forces (1991) *Report of the Task Forces on Development Strategies for the 1990s.* Dhaka : UPL.

UNDP (1999) *Human Development in South Africa.*